ISSN 2394-5737
Vol. II, Year 2016 AD
ITIHAS O SANSKRITI

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ষ ২০১৬ খ্রি.
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র

ISSN 2394-5737 Vol. II
0 2
9 772394 573002
Year 2016

ISSN 2394-5737
ISBN 978-81-926316-4-6
Vol. II, Year 2016 AD

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ষ ২০১৬ খ্রি.

সম্পাদক
ময়ূখ দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
রাজেশ বিশ্বাস, নিতাই গায়েন, অয়ন ব্যানার্জী
প্রতাপ ব্যাপারী, সুকল্যাণ গাইন, সোমনাথ মণ্ডল,
ব্রতজিৎ নস্কর, ঐন্দ্রিলা সেন

সহযোগী সম্পাদকমণ্ডলী
বিদুৎ সরকার, শুভ মজুমদার, সঞ্জিত জোতদার
প্রশান্ত মণ্ডল, পঙ্কজকুমার মণ্ডল, ড. রূপম কুমার দত্ত
স্মরণিকা মাইতি (ব্যানার্জী)

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র
বারুইপুর, কলকাতা- ১৪৪

ITIHAS O SANSKRITI

The Peer-reviewed Proceedings Volume of Second National Level Annual Conference on History

ISSN 2394-5737 (Print)

Vol. II, Year 2016 AD

ISBN 978-81-926316-4-6

© P.A.I.O.L.S.C.K. 2016

Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra
[Reg. No. S/2L/ No. 4626 of 2013-2014]
Village- Madhyakalyanpur, P.O.- Baruipur, Kolkata – 700144
Email: anchalikitihas@gmail.com
Contact No. 8649869471

₹ 2000/-

ই তি হা স ও সং স্কৃ তি

দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ষ ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র-এর পক্ষে মলয় দাস কর্তৃক
মধ্যকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা- ৭০০ ১৪৪ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণ
হরিদাস তালুকদার, রোহিনী নন্দন,
১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১২

গ্রন্থস্বত্ব
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৬

মূল্য
২০০০ টাকা মাত্র

দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় স্তরের ইতিহাস সম্মেলন ২০১৬

২-৩ এপ্রিল ২০১৬, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা)

সাধারণ সভামুখ্য

প্রোফেসর ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়

উদ্‌বোধক ও মূল নিবন্ধকার

প্রোফেসর স্মৃতিকুমার সরকার

বিভাগীয় সভামুখ্যমণ্ডলী

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিভাগ- প্রোফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ

মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাস বিভাগ- প্রোফেসর রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতের ইতিহাস বিভাগ- প্রোফেসর মহুয়া সরকার

ভারত বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস বিভাগ- ড. সিদ্ধার্থ গুহরায়

সমকালীন ভারতের ইতিহাস বিভাগ- প্রোফেসর রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী

আঞ্চলিক ইতিহাস বিভাগ- ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

লোকায়ত ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিভাগ- প্রোফেসর লিপি ঘোষ

সাহিত্যকেন্দ্রিক ইতিহাস বিভাগ- প্রোফেসর অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

সমন্বয়ক

প্রোফেসর অমিত দে

মুখ্য উপদেষ্টা

ড. ইন্দ্রনীল কর

আহ্বায়ক

অধ্যাপক গৌতম সিনহা

বিশেষ সম্মাননীয় অতিথি

প্রোফেসর সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

প্রোফেসর নিখিলেশ গুহ, অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী,

ড. সুপ্রতীম দাশ, ড. রীতা চৌধুরী, ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, ড. হিতেন্দ্র কুমার প্যাটেল,

অধ্যাপক আশীষ কুমার দাস

ইতিহাসকার ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ স্মারক বক্তৃতা

বিষয়: "ব্রতীন্দ্রনাথের ইতিহাস চর্চার কিছু দিক : বিশেষত 'হরিকেল' প্রসঙ্গ"

সভামুখ্য: প্রোফেসর ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়।

বক্তা: প্রোফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ

ইতিহাসকার তপন রায়চৌধুরী বিশেষ স্মারক বক্তৃতা

বিষয়: 'মধ্যযুগের বাংলার দুটি শহর ও নদী'

সভামুখ্য: প্রোফেসর রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

বক্তা: প্রোফেসর অনিরুদ্ধ রায়

ইতিহাসকার আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দিন আহমেদ স্মারক আলোচনা-চক্র

বিষয়– 'ইতিহাস চর্চা: আঞ্চলিক আবেগ ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি'

সভামুখ্য:

প্রোফেসর মেসবাহ কামাল

বক্তাগণ :

প্রোফেসর চিত্তব্রত পালিত

প্রোফেসর রঞ্জিত সেন

প্রোফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ

প্রোফেসর ভাস্কর চক্রবর্তী

আয়োজক

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র

বারুইপুর, কলকাতা- ৭০০ ১৪৪

প্রধান সহযোগী আয়োজক

ইতিহাস বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা)

২৪/২ মহাত্মা গান্ধি রোড, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সহযোগী আয়োজক

ইনস্টিটিউট অব ল্যান্ডস্কেপ, ইকোলজি অ্যান্ড একিস্টিকস্

৩২/২এ হাজরা রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১৯

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় বার্ষিক জাতীয় স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

ISSN 2394-5737 (Print) Vol. II, Year 2016 AD
ISBN 978-81-926316-4-6

সম্পাদকীয় XV
জীববৈচিত্র্য রক্ষায় *মনুসংহিতা*-র অবদান ১
আলোলিকা ভট্টাচার্য্য
গোধিকা বাহিনী দেবী-গৌরী ১০
অনিরুদ্ধ মৈত্র
বিষ্ণুগুপ্তের সমকালীন মনগ্রাঁও তাম্রশাসন: একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা ১৪
অর্পণ গুহ
'গণিকা'-দের শ্রেণিবিন্যাস ও বৃত্তি: *অর্থশাস্ত্র* ও *কামশাস্ত্র*-র পরিপ্রেক্ষিতে ১৯
অরুণিমা গুঁই
সমাজ গঠনে বুদ্ধের মৈত্রী ২৫
বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাবৃত্ত প্রসঙ্গ ৩২
ভবেশ মন্ডল
মনুসংহিতা-র রচনাকাল: একটি ঐতিহাসিক আলোচনা ৩৮
বিভা ভট্টাচার্য্য
রত্নগিরি: বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংগ্রহশালা ৪৪
চন্দ্রাণী পাল
ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ৪৯
এফ.এম. এনায়েত হোসেন
আয়ুর্বেদে আহারতত্ত্ব ও খাদ্যবিজ্ঞান: *চরকসংহিতা* ৫৫
গার্গী দত্ত
বুদ্ধের শিক্ষায় অষ্টবিধ মার্গ : একটি পর্যেষণা ৬১
নীরু বড়ুয়া
পুরাণ ও ইতিহাস ৬৮
পিনাকী শঙ্কর পাণ্ডে
পল্লব পাণ্ডে
যমুনা দেবী – এক বিবর্তনের উপাখ্যান ৭৬
প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
নির্ঋতি ও যমী: বৈদিক সাহিত্যের দুই মৃত্যু সংক্রান্ত দেবী ৮২
ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীন মৃৎভাস্কর্যের প্রেক্ষাপটে তালগাছের
ঐতিহাসিক বর্ণনা ৮৯
শিল্পী দত্ত মৌলিক
অমরাবতী শিল্পে নালাগিরি বশীভূতকরণের দৃশ্যায়ন
শ্রেয়সী রায়চৌধুরী ৯৫
সন্দেশবাহ : *ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র* ও *কামশাস্ত্রে*
শুভজ্যোতি দাস ১০১
ঋগ্বৈদিক যুগে আর্যদের দৈনন্দিন জীবন
শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ ১০৬
প্রাচীন ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিদ্যায় পথ্য : প্রসঙ্গ বৌদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যা
স্মরণিকা মাইতি (ব্যানার্জ্জী) ১১৪
উড়িষ্যার প্রাচীন বৌদ্ধবিহার কুরুমা
শ্রীতমা চক্রবর্তী ১২০
সংস্কৃত সাহিত্যে আয়ুর্বেদের প্রসঙ্গ
সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য ১২৪
খোদিত পাষাণ : প্রস্তরখণ্ডে নাট্যব্যঞ্জনা
শুক্লা দাস ১৩১
প্রাচীন ভারতে সর্বভারতীয় কৃষি অর্থনীতির সূচনা
(আনু. ১৮৭ খ্রি.পূ.-৩২০খ্রি.) ১৩৭
উত্তম কুমার দাস
দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্ন পরিচয় : একটি আলেখ্য ১৪৩
বেগম নাজিয়া সুলতানা
ধম্মপদের প্রাসঙ্গিকতা ১৪৯
জয়িতা গাঙ্গুলী
মোগলমারি : বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে ১৫৬
এক নবতম সংযোজন
নবনীতা বসু
বাংলার ইতিহাস চর্চায় ফারসি উপাদান ও তৎপ্রসঙ্গ ১৬০
মো. আবুল হাসেম
মলুটী গ্রাম ও মন্দিরের ইতিহাস ১৬৭
আজাহার ইসলাম
মধ্যযুগে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনে 'মহিলা-গুরু' : ১৭৪
নারী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
অসীম বিশ্বাস
সুলতানি যুগের বাগেরহাট-খলিফাতাবাদ : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা ১৮৩
মো. আসিফ জামাল লস্কর
মেদিনীপুরের মন্দির স্থাপত্যে ওড়িয়া প্রভাব ১৯১
বিপ্লব মন্ডল

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ : ইতিহাসের সাহিত্য ১৯৮
ব্রতজিৎ নস্কর
সুলকি শাসন : আদি-মধ্যযুগীয় উড়িষ্যায় রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার একটি ২০৪
লেখতাত্ত্বিক গবেষণা
মলয় দাস
বাংলার মুসলমান সমাজের গড়ন (১২০৪-১৭৭০) ২১১
মহ. মইনুল ইসলাম
সুপ্পারক-সৌবারা-সোপারা : একটি বন্দরের যাত্রাপথের কিছু প্রসঙ্গ ২১৮
(পর্ব আদি মধ্যযুগ)
মোনালিসা মুখার্জী
বাংলাদেশে মাতৃশক্তি আরাধনার রূপ ও রীতি : ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য ২২৩
(১৬৫০-১৭৫০ খ্রি.)
মৌসুমী দত্ত
বাণিজ্য-ভূমি সপ্তগ্রাম ২৩১
পৃথ্বীশ কুমার বিশ্বাস
আঠারো শতকে চট্টগ্রামের নগরায়ণ ও নাগরিক জীবন ২৩৯
সুব্রত রায়
লোকগাথায় পৃথ্বীরাজ ২৪৯
সুদেষ্ণা মিত্র
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের বহমানতায় শ্রীনিত্যানন্দের ভূমিকা ২৫৫
সুমনা বসু (দে)
বাংলার লুপ্ত-সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুসদয় দত্ত ও ব্রতচারী আন্দোলন ২৬২
অনুশ্রিতা মণ্ডল
ঔপনিবেশিক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি এবং ২৬৯
'অপ্রতিসাম্যের যুদ্ধ'
অর্ক চৌধুরী
জাতীয়তাবাদের অন্দরে-অন্তরে : বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুত্ববাদ ও ২৭৭
স্যার আশুতোষ
অরুণাংশ মাইতি
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গনে মুসলিম নারী : ইডেন গার্লস্ স্কুল থেকে ২৮৭
লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ
বিদূষী হালদার (হালদার)
বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মেদিনীপুরের জমিদার ২৯৩
মঙ্গল কুমার নায়ক
স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার মুসলিম নারী ৩০১
ইমরান ফিলিপ
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিক্ষা ৩০৮
ইতি চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নারী : বিংশ শতকের ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের দশক ৩১৩
জয়ীতা ব্যানার্জি
স্যার আজিজুল হক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনার ৩১৯
তুলনামূলক আলোচনা
মৃত্যুঞ্জয় পাল
কৃষিবাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে তামাক চাষ ও বাণিজ্যের ৩২৫
অর্থনৈতিক গুরুত্ব : প্রসঙ্গ দেশীয় রাজ্য কোচবিহার
চন্দন অধিকারী
ঔপনিবেশিক যুগের বাঙালির চিন্তায় ভক্তিবাদ : প্রসঙ্গ শিখধর্ম ৩৩৩
ড. করবী মিত্র
প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী : কালজয়ী এক অনন্য মহাপুরুষ ৩৪০
প্রণতি জানা
জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্র : একটি পর্যালোচনা ৩৪৬
রঞ্জনা সরকার (ঘোষ)
বাংলায় মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার উন্মেষ : ৩৫৪
একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯০৫-২১ খ্রি.)
নূরমহম্মদ সেখ
প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা : ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনের দিশারী ৩৬০
পরমা বিশ্বাস
এশিয়াটিক সোসাইটি ও উনিশ শতকে কলকাতার মুসলিম বুদ্ধিজীবী ৩৬৬
প্রশান্ত মণ্ডল
নীল উৎপাদন ও আন্দোলন প্রসঙ্গে সমকালীন বাংলার বিদ্বৎমহল ৩৭৩
রাহুল হাজরা
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনে মানবতাবাদ ৩৮১
রীতা ঘোষ চৌধুরী (কর)
‘মহামানবের মহাপ্রস্থান’- শ্রীঅরবিন্দের ব্রিটিশ রাজত্ব ত্যাগ ৩৮৮
সম্পর্কিত একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
শচীন চক্রবর্ত্তী
স্বদেশি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ৩৯৬
সঞ্জয় প্রামাণিক
তারকনাথ দাশ ও রাসবিহারী বোস : ফ্যাসিবাদ-এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪০৩
দুই প্রবাসী বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি (১৯২২ - ১৯৪৫)
সৌম্য বোস
ধর্মীয় আবরণে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন ৪১২
সোহরাব মণ্ডল
অবিভক্ত বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক: ৪১৯
একটি পর্যালোচনা (১৯২৫-১৯২৯)
শুভ্রশ্রী বেরা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীমহলে 'বৃহত্তর ভারত' চেতনা ৪২৬
সুকন্যা সোম
ঊনবিংশ শতকে বাংলার নদীপথ, নদীর ডাকাত এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা ৪৩৩
তপোবন ভট্টাচার্য্য
ভিন্ন ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ভিন্ন ভাবে পুনর্বাসিত করার একটি অভিনব প্রয়াস: প্রসঙ্গ নরেন্দ্রপুর 'ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি' ৪৩৯
অসিত কুমার কর
নয়া সামাজিক আন্দোলনের নতুনত্ব ও ভারতবর্ষ: একটি আলোকপাত ৪৪৬
বিশ্বনাথ সরকার
সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ : বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সংগ্রাম ৪৫৪
শুভজিৎ ঘোষ
স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতা এবং আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব ৪৬১
আমিনুদ্দিন সেখ
আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণআন্দোলন ও আদিবাসী নারী ৪৬৭
অপর্ণা সাধু
গ্রাম বাংলার জিপসি: একটি রাজনৈতিক ইতিহাস ৪৭৪
অর্ণব কয়াল
ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত দূষণ এবং দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ৪৮০
মনামী মণ্ডল
ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ৪৮৭
ভারতীয়করণের এক বিশেষ ক্ষেত্র - একটি সমীক্ষা
সুলগ্না সোম
সাঁওতালী জনসমাজ ও লোকসংস্কৃতি ৪৯৫
আম্পা কুমার হেমব্রম
ইতিহাস, সংগ্রহশালা এবং সংগ্রহশালাবিদ্যার মধ্যে অনুবন্ধ ৫০৪
অজিতা দেব
দুই চব্বিশ পরগণার সাম্প্রদায়িক মিলনক্ষেত্র পীর-গাজীদের মেলা ৫১২
চন্দন অধিকারী
ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে বনধ্বংস ও আদিবাসী সুরাপান অভ্যাসে বিবর্তন ৫১৯
দেবশ্রী দে
জাতি-রাজনীতি থেকে শ্রেনী ও আঞ্চলিক রাজনীতি: উত্তরবাংলার তপশিলি জাতির নির্বাচনী সংগ্রাম (১৯৩৭-১৯৬৯) ৫২৬
যূথিকা বর্মা
পশ্চিমবঙ্গের মালাকার সম্প্রদায় ও শোলাশিল্প-উদ্ভব ও বিবর্তন ৫৩৪
কুন্দন ঘোষ

দক্ষিন-পশ্চিম সীমান্তবাংলার সদগোপ : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
লক্ষীন্দর পালোই ৫৪২
মহর্ষি মনোমোহন দত্তের মলয়া সঙ্গীত: লোক-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার
মোহাম্মদ শেখ সাদী ৫৪৯
নদীয়া জেলার বাগদি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি সমীক্ষা
মিলন রায় ৫৬০
বাংলার বাউড়ী জাতির সমাজ-সাংস্কৃতিক অন্তর্গঠন ও বিকাশ
ডঃ মনোশান্ত বিশ্বাস ৫৬৮
কুড়িগ্রামজেলার নামকরণ ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে কোচ রাজবংশের প্রভাব
নিবেদিতা রায় ৫৭৬
পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির বর্তমান অবস্থা
পঙ্কজকুমার মণ্ডল ৫৮৪
ঐতিহাসিক এবং পৌরানিক প্রেক্ষাপটে 'শূদ্র' থেকে বঙ্গদেশের 'চন্ডাল'
তথা 'নমঃশুদ্র' জাতির উৎপত্তি ও বিবর্তনঃ একটি পর্যালোচনা
ড. পরিমল ব্যাপারি ৫৯০
বিনয় সরকার ও বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা
প্রসেনজিৎ মুখার্জি ৫৯৮
জাতক : লোকসংস্কৃতির আধার গ্রন্থ
রুমকী মণ্ডল ৬০৫
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির অবদান (১৯০৫ -১৯৪৭)
শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল ৬১০
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও কিছু লৌকিক ব্রত
সুবিনয় দাস ৬১৭
রাইগঞ্জের সুফি-পির-ফকির : লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে
একটি অধ্যয়ন ৬২৪
সুকুমার বাড়ই
জলপাইগুড়ি জেলায় আগত অনগ্রসর অভিবাসীদের মানসিক সংকট :
প্রসঙ্গত-পাকিস্তান থেকে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশ ৬৩২
সুব্রত বাড়ই
পশ্চিমবঙ্গের দলিত রাজনীতি: সাম্প্রতিক প্রবণতা
সুদেষ্ণা দাস ৬৩৮
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা
সুমিতা চক্রবর্তী ৬৪৭
নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার পরিবর্তিত অভিমুখ
সুনীতা মিত্র সরকার ৬৫৫
সুন্দরবনের সমন্বয়ী লোকসংস্কৃতির ইতিহাস
বিপ্লব চক্রবর্ত্তী ৬৬৪
ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি ও জনজাতির আগমন : প্রসঙ্গ সুন্দরবন (১৮৬৫-১৯২৮)
বিপুল মণ্ডল ৬৭২

ইতিহাসের আলোকে কুড়মালি ভাষা ৬৮০
বিশ্বজিৎ গায়েন
দেবী মনসা : নারীর ক্ষমতায়ন ৬৮৮
আলোকপর্ণা বসু
বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও পুনর্বাসিত মানুষের জীবন-সংগ্রাম : ৬৯৭
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
অপর্ণা দে
স্বাধীনতা-পূর্ব বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলন ও মেয়েরা ৭০৪
শ্রেয়া রায়
নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে জেলেদের জীবন বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও ৭১২
লোকসংস্কৃতির উপাদান
সমরেশ মন্ডল
শিবরূপের বিবর্তন : বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে ৭২০
অয়ন মুখোপাধ্যায়
ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলন ও ৭২৭
বিদ্রোহী গণকবি নজরুল
শ্রী বিপুলকুমার ঘোষ
প্রতিবাদী নারী ভাবনায় কবি কৃষ্ণা বসু ৭৩৫
রুম্পা ভদ্র
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মনিরউদ্দীন ইউসুফ-এর অনন্য প্রতিভা : ৭৪৩
প্রসঙ্গ শাহনামা অনুবাদ
ড. মো. নূরে আলম
নকশাল আন্দোলন ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ৭৫০
মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ
স্বাধীনতার কাল : বাংলা কথাসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৭৫৭
সুধাংশুশেখর মণ্ডল
কবি মোজাম্মেল হক ও তাঁর সাহিত্য ভাবনার দু-একটি খণ্ড চিত্র ৭৬৪
পলি সরকার
পূর্ব বাংলার বাংলা কবিতায় পাকিস্তানবাদ ৭৬৯
প্রতাপ ব্যাপারী
বিশ শতকের শেষ দুই দশকের পশ্চিমবঙ্গ : রবিশংকর বলের মণিময় ও ৭৮৫
গল্পকারের আত্মদর্শনে সমসময়ের অভিঘাত
রজত দত্ত
উনিশ শতকে বাঙালী অন্ত্যজ এক নারীর আত্মকথন : ৭৯২
গোলাপসুন্দরী তথা সুকুমারী দত্ত
সঙ্গীতা দাস
মেদিনীপুরের ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ৮০০
(১৮৩২-১৮৮৫) ও তাঁর সাহিত্য চর্চা
সেক আবুল

দেশবিভাজন ও নারীজীবন : সাহিত্য ও ইতিহাসের দর্পণে
সুজিত কুমার শাসমল ৮০৯
চর্যাপদে নারী
ড. সুস্মিতা ভট্টাচার্য ৮১৭
আনোয়ারা উপন্যাসের আলোকে বিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ
মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী ৮২৫
গান্ধীর সমাজ চিন্তা : বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার নিরিখে একটি
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৮৩৩
দেবাশীষ পাল
দেশভাগ, দেশত্যাগ ও নগরায়ণ : হালতু -একটি ক্ষেত্রচর্চা (১৯৪৭-৭০) ৮৪০
অভিরূপ সিন্‌হা
উত্তরপাড়া : গঙ্গার পশ্চিমকুলের একটি জনপদের বিবর্তনের কাহিনী ৮৪৬
অনিমেষ দাস
পত্তনি ব্যবস্থা ও বর্ধমান রাজ ৮৫৪
অরুন্ধতী সেন
নদিয়ার পুরাকীর্তি ও নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ৮৬১
ভবানন্দ রায়
নদিয়ার পুরাকীর্তি ও নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ৮৬৯
ভবানন্দ রায়
লবণশিল্পে বসিরহাটের স্থান (১৭৫৭-১৮৫০খ্রি.) ৮৭৪
উজ্জ্বল বিশ্বাস
কোচবিহার রাজ্যে রিজেন্সির সময় কালে কৃষিজ অর্থনীতি ৮৮২
ড. সূর্য নারায়ণ রায়
সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা
ব্যবসা ও শিল্পে বাঙালি : প্রসঙ্গ দার্জিলিং জেলা ৮৮৮
সুপম বিশ্বাস
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য কেন্দ্র রায় ৮৯৫
ড. সুজিত ঘোষ
উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গের রাজকীয় হস্তশিল্প শীতলপাটি ৯০৪
সুচেতনা পাল
নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তু আন্দোলন ৯০৮
ড. সুভাষ বিশ্বাস
দার্জিলিং শহরের নগরায়নের গতিপ্রকৃতি : একটি পর্যালোচনা ৯১৬
সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সাঁওতালদের ভূমিচ্যুতি এবং অস্তিত্বের সংকট : ৯২১
একটি সমীক্ষা
শ্রী প্রদীপ কুমার দাস
সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস ও জনবসতি স্থাপন ৯৩৪
মানস দাস

ঔপনিবেশিক উত্তরবঙ্গের মহিলা চা-শ্রমিক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৯৪০
মনদেব রায়
কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা ও মানুষের প্রতিক্রিয়া : ঔপনিবেশিক বাঁকুড়া ৯৪৬
কাঞ্চন গাঙ্গুলী
তীর্থস্থান কেন্দ্রিক শহরের উৎপত্তি : প্রসঙ্গ তারকেশ্বর ৯৫২
জয়দীপ ঘোষ
ইতিহাসে বসিরহাট : একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা ৯৬০
সৌমেন মণ্ডল
ঔপনিবেশিক নদিয়া জেলায় অপরাধকর্মে জমিদার শ্রেণির ভূমিকা ৯৭০
ড. সিরাজুল ইসলাম
আঞ্চলিক ইতিহাস ও কিংবদন্তী : একটি সান্দর্ভিক মূল্যায়ন ৯৭৭
শেখর শীল
কোচবিহার জেলার গ্রাম নামের উৎস সন্ধানে ৯৮৫
মনোজিৎ দাস
পবিত্র কুঞ্জবন (Sacred Groves) এর ধারণা ও আধুনিক অরণ্যনীতি : ৯৯৪
ভারতবর্ষের নিরিখে একটি পর্যালোচনা
সোমনাথ মণ্ডল
পৃথিবীর জলবায়ুতে হিমযুগ ও আন্তঃহিমযুগ : একটি ভৌগোলিক ইতিহাস পর্যেষণা ৯৯৯
ড. রূপম কুমার দত্ত
বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতার ফুটবল : বিতর্ক, ১০০৮
পুনরুত্থান এবং ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
দেবাশিস মজুমদার
বিরোধ–সমঝোতা-সহাবস্থান : মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এক সমকালীন চিত্র ১০১৫
ময়ূরাক্ষী দাস
বন্যা ও মুর্শিদাবাদের জনজীবন : প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা (১৮৬০-১৯৬০) ১০২২
মুসাদ্দেক হোসেন
প্রধানমন্ত্রী নেহরুর শিল্পনীতি ও প্রযুক্তি ভাবনা ১০৩০
সুজিত রাজবংশী
সমাজের জন্য বিজ্ঞান : একটি প্রয়াসের ইতিহাস (১৯৮০-২০০০) ১০৩৬
সুকল্যাণ গাইন
বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে দাশরথি তা-র অবদান (১৯১১-১৯৮০খ্রি.) ১০৪৩
সামীম রহমান মোল্লা
ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : ছিন্নমূল বাঙালির যাপন গাথা ১০৪৮
সুপ্রিয় কাঞ্জিলাল
বাংলার চটশিল্পে বিনিয়োগ : ১৯৪০-৭০ খ্রি. ১০৫৩
ত্রিদিব মণ্ডল

শিক্ষা বিস্তারে ঐতিহ্যবাহী হুগলি মাদ্রাসা (১৮১৭-২০১৬):
দ্বিশতবর্ষে আলোকে ফিরে দেখা ১০৬০
মুহাম্মদ জিন্নাতুল্লা শেখ
চলচ্চিত্রকারগণের চোখে ষাট-সত্তর দশকে কলকাতার ছাত্র-যুব-সমাজ
শিপ্রা সিংহরায় ১০৬৯
ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ ও মহিলা প্রতিনিধিত্বের বিবর্তন (১৯৫২-১৯৯৩) ১০৭৬
উজ্জয়িনী সামন্ত রায়
ঝাড়খণ্ডি জাতিসত্ত্বার বিকাশ : একটি অসম্পূর্ণ আকাঙ্খা
প্রকাশ বিশুই ১০৮৩
পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন : হলদিয়া মহকুমার একটি প্রেক্ষিত
শেলী দত্ত ১০৯০
মরিচঝাঁপির গণহত্যা: একটি রাজনৈতিক আঙ্গিক
মৃত্যুঞ্জয় প্রামানিক ১০৯৮
ময়লা আঁচল-এর প্রেক্ষাপটে কৃষক সংগ্রাম এবং কংগ্রেস ও সোসালিস্ট পার্টির ভূমিকা ১১০৪
বিমল কুমার মণ্ডল
উনিশ শতকে বাংলার গ্রামীণ জীবন: প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ১১০৯
আনন্দ বিকাশ চাকমা
ভুটান রাষ্ট্রে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর ১১২২
উদ্ভব ও বিকাশ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
বাপ্পা মহন্ত
বাংলাদেশ : দোলাচল বৃত্তিতে সুশীল সমাজ ১১৩১
হিরোজ্যোতি খাঁ
লোকসাহিত্যে জাপানী বীরকথা ১১৩৯
কস্তুরী রায় চ্যাটার্জী
ব্রিটিশ যুগে রেঙ্গুনে কাজের সন্ধানে ভারতীয়রা : ১৮৮৬-১৯৩৭ ১১৪৪
পারমিতা দাস
ঐতিহ্যবাহী রেশম পথের পতন : একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১১৫১
পূর্ণেন্দু শেখর রায়
ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী নায়ক হো চি মিন ১১৬১
রাকেশ বিশ্বাস
বাংলার কৃষি-উৎসব : ধামইরহাটের নবান্ন ১১৬৭
মো. শাহিনুর রশীদ
পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠী (চাকমা, মারমা) মগ, ১১৭৪
রাখাইন জাতিনামের পরিচয় বিবৃতি ও সংস্কৃতির আলেখ্য
সৌমিতা মিত্র
শ্রী নালন্দা মহাবিহার, ১১৮৩
শুভাশীষ বড়ুয়া (সুমনপাল ভিক্ষু)
বাংলার লোকাচারে ধর্ম ১১৯১
অরুমিতা দে

Itihas O Sanskriti, Vol. II, 2016, ISSN 2394-5737, ISBN 978-81-926316-4-6

সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ : বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সংগ্রাম

শুভজিৎ ঘোষ

অ্যাসিস্টেন্ট প্রোফেসর, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়
subha.sjg@gmail.com

সারসংক্ষেপ: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত করে। পাঞ্জাব বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু, শিখ, জাঠ ও অন্যান্য উদ্বাস্তুদের ভারত সরকার যতটা সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, বাঙালি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবে বাঙালি উদ্বাস্তুদের নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করতে হয়েছিল সংগ্রামের মাধ্যমে। আর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল ইউ.সি.আর.সি (United Central Refugee Council) বা সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ। বাঙালি উদ্বাস্তুর আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামী সংগঠন সম্পর্কে কোন লেখা চোখে পড়ে না। আসলে বাঙালি উদ্বাস্তুদের নিয়েই আলোচনা এত কম যে সেখানে কোথাও স্বতন্ত্রভাবে ইউ.সি.আর.সি স্থান পায়নি। এই সীমিত পরিসরে ইউ.সি.আর.সি প্রতিষ্ঠা থেকে প্রথম কয়েক বছরের সংগ্রামের একটি খন্ডচিত্র তুলে ধরা গেল।

সূচক-শব্দ: উদ্বাস্তু, দাঙ্গা, পার্টিশন, পুনর্বাসন, জবরদখল কলোনি, United Central Refugee Council।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিনটি ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে ঐ দিন ভারতীয় উপদ্বীপের মানুষেরা পায় তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ ফিকে হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে। ভারত বিভাজনের সব থেকে বেশি দায় বহন করতে হয়েছিল পাঞ্জাব এবং বাংলাকে। কারণ আক্ষরিক অর্থে প্রায় আধাআধি বিভাজন হয়েছিল এই দুটি প্রদেশের। প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হিংসা ও হানাহানির মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাঞ্জাব বা আরও ভাল করে বললে বলতে হয় পশ্চিম সীমান্তে জন বিনিময় হয়েছিল অতি দ্রুত এবং ১৯৫০ সালের মধ্যেই এই অঞ্চলে জনবিনিময় প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[১] কিন্তু পূর্ব সীমান্তে বিশেষত বাংলায় এই সমস্যা শুধু দীর্ঘস্থায়ীই হয়নি বরং তা আজও চলেছে।[২] পশ্চিম সীমান্তের মতো পূর্ব সীমান্তে উদ্বাস্তু জনগণের প্রবাহ দ্বি-মাত্রিক হয়নি বরং বিপুল পরিমাণ হিন্দু বাঙালি

পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করে, এই প্রক্রিয়া আজও চলছে। পশ্চিম পাঞ্জাব বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু, শিখ, জাঠ ও অন্যান্য উদ্বাস্তুদের ভারত সরকার যতটা সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, বাঙালি উদ্বাস্তু দের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি[৩]।

বাঙালি উদ্বাস্তুদের ভারত সরকার তার নিজের বলে মনে করল না, যদিও কিছুদিন পূর্বেও তারা ভারতীয় ছিল। ভারত সরকার বার বার এদের ভ্রাতৃসম বললেও বাস্তবে এরা যাতে ভারতে না চলে আসে তার সবরকম প্রচেষ্টা শুরু করল। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বেশি সাহায্য দিতে চাইল না। তাদের আশংকা ছিল এই উদ্বাস্তুরা সুযোগসুবিধা পেলে এদেশে থেকে যাবে। [৪]

স্বাভাবিক ভাবে বাঙালি উদ্বাস্তুদের নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করতে হয়েছিল সংগ্রামের মাধ্যমে। আর বাঙালি উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল ইউ.সি.আর.সি (United Central Refugee Council) বা সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ। বাঙালি উদ্বাস্তুর আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামী সংগঠন সম্পর্কে কোন লেখা চোখে পড়ে না। আসলে বাঙালি উদ্বাস্তুদের নিয়েই আলোচনা এত কম যে সেখানে কোথাও স্বতন্ত্রভাবে ইউ.সি.আর.সি স্থান পায়নি। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী-র *প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুজীবনের কথা* ছাড়া বাংলা বা ইংরাজি কোন গ্রন্থেই ইউ.সি.আর.সি.-র বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা পাওয়া যায় না।

দেশভাগের সিদ্ধান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা পশ্চিমবঙ্গে এল তারা কংগ্রেস বা বামপন্থী কোন মতাদর্শের প্রতিই বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত না। পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিপ্লবী দলগুলির প্রভাবই বেশি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা শাসকদলের বিরুদ্ধে যেতে চায়নি। বামপন্থী দলগুলির জনপ্রিয়তা এই সময় ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। পার্টির জনযুদ্ধ নীতি, ৪২ এর আন্দোলনের বিরোধিতা, সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষের নীতি পার্টিকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে ছিল। এই সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় ৫০টি ছোট বড় উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে কলিকাতার উত্তর এবং দক্ষিণ শহরতলিতে নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ (এন.ভি.বি.কে.পি.) ও দক্ষিণ কলিকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতি ছিল অন্যতম।[৫] তবে নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদকেই প্রকৃতপক্ষে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের আদিরূপ বলা যায়।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নৈহাটিতে সারা বাংলা উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই সারাবছর উদ্বাস্তু দাবিদাওয়া নিয়ে কাজ করার জন্যে নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ (এন.ভি.বি.কে.পি.) গঠিত হয়[৬]। কর্মপরিষদের বেশিরভাগ সদস্যই কংগ্রেসের হলেও বিজয় মজুমদার প্রমুখরা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় লুকিয়ে এন.ভি.বি.কে.পি.-র সদস্য হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত অনুসারে এন.ভি.বি.কে.পি.- র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে একটি স্মারকলিপি দিতে গেলে নেহরু তা উপেক্ষা করেন। তিনি এন.ভি.বি.কে.পি.-র প্রতিনিধিদের বিদেশ দপ্তরেরে সাথে যোগাযোগ

করতে বলেন কারন উদ্বাস্তুরা বিদেশি।[৭] এর ফলে কর্মপরিষদ বুঝতে পারে উদ্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে সকল উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি বৃহত্তর ফ্রন্ট গঠন করতে হবে। কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীর এহেন আচরণ এন.ভি.বি.কে.পি.-র কংগ্রেসি নেতৃত্বকে দুর্বল করে।

১৯৪৮ এর ডিসেম্বর মাসে কর্মপরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলনে মহাদেব ভট্টাচার্য, বিজয় মজুমদার প্রমুখর ন্যায় সংগ্রামী নেতাদের কর্মপরিষদে গুরত্ব বৃদ্ধি পায়। কর্মপরিষদ ক্রমশ সংগ্রামী হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী জওহরলাল নেহরু ব্রিগেড পারেড গ্রাউন্ডের সরকারি সভাতে যোগ দিলে প্রায় ১৫০০০ উদ্বাস্তু এন.ভি.বি.কে.পি. -র নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শিয়ালদহ স্টেশনে তারা অনশন আন্দোলন শুরু করে। কলিকাতার ছাত্র সমাজ উদ্বাস্তুদের সমর্থনে ১৮ই জানুয়ারী ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্র এবং উদ্বাস্তুদের যৌথ আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮ এবং ১৯সে জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে ৯জনের মৃত্যু হয়, প্রায় ২১৫ জন গ্রেপ্তার হন। ১৯টি ট্রাম এং ৫ টি সরকারি বাস পোড়ান হয়। এই দুদিনের রক্তাক্ত সংগ্রাম এবং সরকারী দমন নীতি উদ্বাস্তু নেতৃত্বকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্বাসনের স্থায়ী সমাধানের জন্য উদ্বাস্তুদের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অবশ্যিক।[৮]

১৯৫০ এর দশকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বিপুল পরিমান মানুষকে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।[৯] কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিও বিপ্লবী অভ্যুত্থানের নীতি ত্যাগ করে কংগ্রেসের বিকল্প ফ্রন্ট তৈরীতে মনযোগী হওয়ার বাঙালি উদ্বাস্তুদের সুবিধা হয়ে যায়। অবশ্য প্রথম থেকেই বিজয় মজুমদার, অনিল সিংহ, গোপাল ব্যানার্জী, অম্বিকা চক্রবর্তী, সহ বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতা বিভিন্ন স্থানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে (বিশেষত কলিকাতা সংলগ্ন জেলা গুলিতে) ঘুরে ঘুরে তারা ছোট ছোট উদ্বাস্তু সংগঠন গুলিকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা করেন, তারা 'Lead the all Bengal United Refugee Council Conference to be held on 12 and 13 August to Success' শিরোনামে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে একত্রিত হবার জন্য আহ্বান জানান। ১২ অগাস্ট (১৯৫০) ৪০টিরও বেশি ছোট বড় উদ্বাস্তু সংগঠন ও কলোনির প্রতিনিধিরা মিলিত ভাবে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এই সম্মেলনে সি.পি.আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার, আর.সি.পি.আই, ডেমোক্র্যাট ভানগার্ড বলশেভিক পার্টি, সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি ও হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা ছিলেন। স্থির হয় যে এই কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কমিটির সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। ১৯৫০ সালের ১৩ই অগাস্ট সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা

পরিষদের (ইউ.সি.আর.সি)জন্ম হয়। জন্মদিবসেই ইউ.সি.আর.সি বিভিন্ন ক্যাম্প ও কলোনি থেকে প্রায় ৫০০০০ উদ্বাস্তুকে সমবেত করে এবং উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারি উদাসীনতার প্রতিবাদ ও পুনর্বাসনের দাবি উত্থাপন করে।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সি.পি.আই-এর সদস্য সংখ্যা বেশি হলেও যাতে সংগঠন কোন দলের হাতের পুতুলে পরিণত না হয় সেদিকে নজর রেখে কতগুলি নীতি গ্রহণ করা হয়-

১. ঠিক হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে।
২. যতদূর সম্ভব ইউনিটগুলির সম্মতির ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করা হবে।[১০]

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আবার জোরকদমে শুরু হয়ে যায়। প্রায় রাতারাতি উত্তর ২৪ পরগণা, এবং দক্ষিন কলিকাতার বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিগুলি ভরে যাই সারি সারি দরমা, হোগলা পাতা আর টালির ঘরে। ইউ.সি.আর.সি,-র সামনে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল এই অবৈধ জবরদখল কলোনিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। কলিকাতা ও তার পাশ্ববর্তী এলাকার জবরদখল করা কলোনি প্রতিষ্ঠার লড়াই ইউ.সি.আর.সি,-র সংগঠনকে একেবারে নীচুতলা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। শুভশ্রী ঘোষ সঠিক ভাবেই বলেছেন:

> 'From then on, it was the UCRC that took up the cause of the migrants. They fostered the regularisation of the squatters' colonies, opposed the deportation of the refugees outside West Bengal in the name of rehabilitation, and protested against the arbitrary stoppage of doles to the camp inmates.'[১১]

মাহেশের জবরদখল কলোনির প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা U.C.R.C-র সামনে প্রথম বড় চ্যালেঞ্জটি উপস্থাপন করে। হুগলি জেলার মাহেশ-এ অরুণ সেন-এর নেতৃত্বে উদ্বাস্তুরা জমির মালিক ও পুলিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। প্রায় তিনমাস বার বার তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যাবতীয় অত্যাচার সত্ত্বেও কিছুতেই উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা গেল না। কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মাহেশের জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে পুলিশি অত্যাচারের খবর প্রকাশিত হয়। বিষয়টি নিয়ে মামলা হলে আদালত মামলাটিকে দেওয়ানি মামলা হিসাবে দেখে এবং জানায় যে কোন ব্যক্তি দখলকারী বাড়ি বা জমিতে একটানা তিন মাস বাস করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করা যাবে না। আদালতের এই রায় উদ্বাস্তুদের উৎসাহ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে উদ্বাস্তুদের পুলিসি হাঙ্গামার আশঙ্কা দুর হয়। দেওয়ানি মামলায় জমির মালিককে জমির মূল্যের ১২.৫ শতাংশ অর্থ কোর্ট-ফি' হিসাবে জমা করে মামলা রুজু করতে হতো। ফলে আদালতের রায়ে জমির মালিকরা হতাশ হন। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবৈধভাবে জমি দখলকারীদের উচ্ছেদের জন্য একটি খসড়া প্রস্তুত করে। এই খসড়া আইনটিই পরবর্তী কালে Act XVI of 1951 নামে পরিচিত হয়। খসড়া আইনে বলা হয় যে, জমির মালিকদের জমির দামের ৫০ পয়সা হারে কোর্ট-ফি' দিতে হবে।

জবরদখল করা উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে বসবাসকারীদের নাম সংগ্রহ করার দায়িত্ব আদালতের পরিদর্শকদের উপর চাপান হয়। কারণ ভিনদেশ থেকে আগত রাতারাতি জমির জবরদখলকারীদের নাম-পরিচয় জোগাড় করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। সেহেতু খসড়া আইনে দখলকারী কলোনির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে জমির মালিকের করা মামলা দেওয়ানি মামলা হিসাবে গ্রাহ্য হয়, সেহেতু দীর্ঘসময় ধরে মামলা চলাকালীন জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা এই আইনে বলা হয়।[১২]

Act XVI of 1951 বিধানসভায় পেশ করার পূর্বে আইনের খসড়াটি প্রকাশ করা হয়। ১৯৫১ সালের ২০ মার্চ ডা.বিধানচন্দ্র রায় এই আইনের সম্পর্কে বলেন যে, ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত, সুতরাং উদ্বাস্তুরা জমির মালিকদের সেই অধিকার লঙ্ঘন করেছেন, পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে তদের পুনর্বাসনের কথা বলেন যা এই খসড়া আইনেও বলা ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে ইউ.সি.আর.সি-কে এই আইনকে প্রতিরোধ করার জন্যে আন্দোলন শুরু করতে হয়। আন্দোলনের প্রাথমিক রূপরেখা হিসাবে ইউ.সি.আর.সি বিভিন্ন জবরদখল কলোনিগুলিতে প্রচার অভিযান শুরু করে। বিধানসভার সহানুভূতিশীল সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় ও এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য উদ্বাস্তুদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়।

সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উগ্র হিংসাত্মক আন্দোলনের পরিবর্তে সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। যদিও ইউ.সি.আর.সি কেন্দ্রীয় সংগঠনে সি.পি.আই-এর প্রভাব বেশি ছিল তবুও সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে নেওয়া হয়। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টিও ইতিমধ্যে সংগ্রামের পথ থেকে সরে এসেছিল। ইউ.সি.আর.সি-র আশংকা ছিল উগ্র হিংসাত্মক আন্দোলন গড়ে তুললে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের সহানুভূতি তারা হারাতে পারে। তাছাড়া সরকারকেও তাঁরা অহেতুক দমননীতি প্রয়োগের সুযোগ দিতে চাননি। কলিকাতার আশেপাশের কলোনিগুলিতে ইউ.সি.আর.সি-র নেতৃত্ব বার বার মিটিং মিছিল সংগঠিত করে কলিকাতার তথা বাংলার মানুষকে নিজেদের প্রবল উপস্থিতি জানান দেয়। ইউ.সি.আর.সি-র নেতৃত্বের নিপুণ পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতার শহরতলির উদ্বাস্তুরা কলিকাতা নগরীকে মিছিল নগরীতে পরিণত করে। কলিকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত হয় উদ্বাস্তুদের স্লোগানে- "আমরা কারা, বাস্তুহারা"। এই সময় কলিকাতার রাজপথে ইউ.সি.আর.সি-র নেতৃত্বে একাধিক মিটিং মিছিল সংগঠিত হয়েছিল।[১৩] ১৯৫১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ময়দানের একটি সভাতে ইউ.সি.আর.সি.-র পক্ষ থেকে যে দাবিগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দাবিগুলির কয়েকটি ছিল উদ্বাস্তুদের একেবারে নিজস্ব, যেমন-জবরদখল কলোনিগুলিকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা চলবে না বা উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মতো দাবিগুলি রাখা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষদের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন মানুষদের পাশে পেতে। কারণ তাদের

আন্দোলন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আলাদা হয়ে যাক তা ইউ.সি.আর.সি-র নেতৃত্ব চায়নি। তারা বাঁচার তাগিদে অবৈধ ভাবে জমি দখল করলেও তারা তা ন্যায্য মূল্যে কিনে নিতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল জমিদারদের বিপুল ভূসম্পত্তির বা সরকারের অব্যবহৃত পতিত জমির পুনর্বণ্টন। তাদের মনে হয়েছিল এক্ষেত্রে তারা পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের পাশে পাবেন। আর কমনওয়েলথ ছাড়ার ডাক বা সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক প্রভৃতি দাবিগুলি এসেছিল নেতৃত্বের বাম মানসিকতা থেকে।

ইউ.সি.আর.সি এবং আর.সি.আর.সি. (আর.এস.পি.-র নেতৃত্বাধীন)-র প্রবল আন্দোলন এবং বাস্তব অবস্থার বিচার করে সরকার আইনের খসড়াতে পরিবর্তন করে।[১৪] ঠিক হয় ১৯৪৬-১৯৫০ পর্যন্ত যারা উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছিলেন তাদের বৈধ উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য করা হবে। আইনের খসড়াতে দখলকারীদের সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের দায়িত্ব যোগ্য কর্তৃপক্ষের ওপর প্রদান করা হয়েছিল। সেই কাজ করবেন একজন বিচারবিভাগীয় অফিসার যাকে নিয়োগ করবেন হাইকোর্ট। উদ্বাস্তুদের কলিকাতার আশেপাশে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যদি উদ্বাস্তুরা ১৯৫০-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মিটিয়ে দেয় তাহলে তারা জমির বৈধ মালিক হতে পারবে। তবে খসড়া আইনের মৌলিক কোন পরিবর্তন করা হল না। খসড়া আইনকে প্রতিরোধ করা না গেলেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাস এষণা ১
ISBN : 978-81-929386-4-6

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা: বিধানচন্দ্র রায়-এর অবদান

শুভজিৎ ঘোষ*

সারসংক্ষেপ: ১৯৪৭ এর দেশভাগের সবথেকে বেশি প্রভাব পরেছিল পাঞ্জাব এবং বাঙলার ওপর। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাধ্য হয়েছিলেন তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে সীমন্তের অপর পারে আশ্রয় নিতে। বিপুল হিংসা রক্তক্ষয় প্রভৃতির মধ্যদিয়ে ১৯৫০ সালের শেষের দিকে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু পুর্বসীমান্তে বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমশ জটিল হচ্ছিল।লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হচ্ছিল। ১৯৫০ সালে পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে উদ্বাস্তু আগমন আরও বৃদ্ধিপায়। বিপুল উদ্বাস্তু জনতার চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পরে। এরকম পরিস্থিতিতে ড. বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রি হিসাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। ভারত সরকারের সাহায্য ছাড়া শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গের সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিলনা। তাসত্ত্বেও ড. রায় সবরকম ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে নিজ দেশ ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হওয়া এই বিপুল সংখ্যক নরনারী নুন্যতম মানবিক সুযোগ সুবিধাটুকু পায়। স্বভাবতই ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বিভিন্ন প্রগতিশীল এবং মানব দরদী কাজের পাশাপাশি দেশভাগ জনিত কারণে আসা হাজার হাজার অসহায় উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনে তাঁর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে।

সূচকশব্দ: দেশভাগ, উদ্বাস্তু, দাঙ্গা, পুনর্বাসন।

মাউন্টব্যাটান পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের যে সিদ্ধান্ত হয় তাতে ভারতবর্ষের দু-প্রান্তে (পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান) পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা হয়। দেশ বিভাগের প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্রই কমবেশি অনুভূত হলেও পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং পূর্বে বাংলা এই দুই প্রদেশেই সব থেকে বেশি পড়েছিল। কারণ এই দুই প্রদেশকেই দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। এর ফলে বিপুল পরিমাণ শিখ এবং হিন্দু বাধ্য হয় পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে পূর্ব দিকে ভারতীয় অংশে চলে আসতে। আবার পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রাণ এবং সম্মান বাঁচাতে বাধ্য হয় পাকিস্তান অধীনস্থ অঞ্চলে সরে যেতে। প্রচণ্ড হিংসা এবং রক্তপাতের মধ্যদিয়ে ১৯৫০ সালের মধ্যে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়ে যায়।[১] অন্যদিকে বাংলায় বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু আক্রান্ত হয়ে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে চলে আসতে থাকে।[২] পূর্ববঙ্গের থেকে বিপুল সংখ্যক এই মানুষের আগমন একবারে হয়নি।

---

*অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, রাধানগর, হুগলি।

ইতিহাস এষণা ১
ISBN : 978-81-929386-4-6

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা: বিধানচন্দ্র রায়-এর অবদান

শুভজিৎ ঘোষ*

সারসংক্ষেপ: ১৯৪৭ এর দেশভাগের সবথেকে বেশি প্রভাব পরেছিল পাঞ্জাব এবং বাঙলার ওপর। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাধ্য হয়েছিলেন তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে সীমন্তের অপর পারে আশ্রয় নিতে। বিপুল হিংসা রক্তক্ষয় প্রভৃতির মধ্যদিয়ে ১৯৫০ সালের শেষের দিকে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু পুর্বসীমান্তে বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমশ জটিল হচ্ছিল।লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হচ্ছিল। ১৯৫০ সালে পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে উদ্বাস্তু আগমন আরও বৃদ্ধিপায়। বিপুল উদ্বাস্তু জনতার চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পরে। এরকম পরিস্থিতিতে ড. বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রি হিসাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। ভারত সরকারের সাহায্য ছাড়া শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গের সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিলনা। তাসত্ত্বেও ড. রায় সবরকম ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে নিজ দেশ ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হওয়া এই বিপুল সংখ্যক নরনারী নুন্যতম মানবিক সুযোগ সুবিধাটুকু পায়। স্বভাবতই ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বিভিন্ন প্রগতিশীল এবং মানব দরদী কাজের পাশাপাশি দেশভাগ জনিত কারণে আসা হাজার হাজার অসহায় উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনে তাঁর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে।

সূচকশব্দ: দেশভাগ, উদ্বাস্তু, দাঙ্গা, পুনর্বাসন।

মাউন্টব্যাটান পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের যে সিদ্ধান্ত হয় তাতে ভারতবর্ষের দু-প্রান্তে (পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান) পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা হয়। দেশ বিভাগের প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্রই কমবেশি অনুভূত হলেও পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং পূর্বে বাংলা এই দুই প্রদেশেই সব থেকে বেশি পড়েছিল। কারণ এই দুই প্রদেশকেই দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। এর ফলে বিপুল পরিমাণ শিখ এবং হিন্দু বাধ্য হয় পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে পূর্ব দিকে ভারতীয় অংশে চলে আসতে। আবার পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রাণ এবং সন্মান বাঁচাতে বাধ্য হয় পাকিস্তান অধীনস্থ অঞ্চলে সরে যেতে। প্রচণ্ড হিংসা এবং রক্তপাতের মধ্যদিয়ে ১৯৫০ সালের মধ্যে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়ে যায়।[১] অন্যদিকে বাংলায় বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু আক্রান্ত হয়ে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে চলে আসতে থাকে।[২] পূর্ববঙ্গের থেকে বিপুল সংখ্যক এই মানুষের আগমন একবারে হয়নি।

---

*অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, রাধানগর, হুগলি।

১৯৪৬ এর নোয়াখালী দাঙ্গার সময় থেকে পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক মানুষের পশ্চিমবঙ্গে আসা শুরু। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগ ও সীমান্ত কমিশনের ঘোষণার সাথে সাথে বিপুল পরিমাণে মানুষ সীমান্তের এ পাড়ে সরে আসে। এই সমস্ত মানুষেরা বেশিরভাগই ছিল রাজনীতি সচেতন এবং সম্ভ্রান্ত। এরা আশঙ্কা করে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং সেখানে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হবে। সুতরাং তাদের সেদেশে কোন ভবিষ্যৎ নেই। অনেক ক্ষেত্রেই এদের পরিবারের সদস্যরা বা আত্মীয়-স্বজন পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানে বিশেষত কলকাতায় পূর্ব থকেই ছিল।[৩] ফলে প্রাথমিক পর্বে যারা আসে তাদের পুনর্বাসনের সেরকম কোন দরকার ছিলনা তেমনি সংখ্যাটাও বিপুল না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকারের কাছে ব্যাপারটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ১৯৫০ এর প্রথম থেকেই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষত, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হলে বিপুল সংখ্যায় মানুষ বাধ্য হয় প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে আশ্রয় নিতে। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন-'যন্ত্রণায় কাতর নিরূপায় ও পুরোপুরি বিধ্বস্ত এক বিপুল মনুষ্য গোষ্ঠী এক বিশাল হিমবাহের মতো পশ্চিমবঙ্গে এসে আছড়ে পড়ে'। এই বিপুল জনস্রোতের চাপে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক যন্ত্র প্রায় ভেঙে গিয়েছিল।"[৪] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুর সংখ্যা হয় প্রায় ৩৫ লক্ষ।[৫] এই বিশাল উদ্বাস্তু জনতার চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এরকম এক দুর্দিনে অত্যন্ত দক্ষতার এবং বিচক্ষণতার সাথে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব দেন ড. বিধানচন্দ্র রায়।

বিধানচন্দ্র রায় ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বিহারের পাটনা জেলার সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। পরে পাটনা কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তাঁর মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা চালাতে হয় অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যদিয়ে। এই সময় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বিধানচন্দ্র এই আন্দোলনের দ্বারা দারুণ ভাবে প্রভাবিত হন। নিজে নানা ভাবে অর্থ উপার্জন করে তিনি ইংল্যান্ডের সেন্ট বার্থালেমিউ হসপিটালে পড়াশোনা করেনে এবং মাত্র দুবছর তিনমাস সময়ে M.R.C.P. এবং F.R.C.S. সম্পূর্ণ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রথমে কলকাতা মেডিকেল কলেজে এবং পরে যথাক্রমে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন।

তিনি বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।যার মধ্যে অন্যতম ছিল যাদবপুর টি.বি. হসপিটাল, চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন, কমলা নেহরু হসপিটাল, ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটাল প্রভৃতি। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর পদে কর্মরত ছিলেন। এই সময় কলকাতায় জাপানী আক্রমণের ভয়ে অনেকেই শহর ত্যাগ করতে শুরু করলে ড. রায় ছাত্রদের জন্য বিমান হানার থেকে রক্ষা পাওয়ার মত শেল্টারের ব্যবস্থা করেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন বিঘ্নিত না হয়। ড. বিধান চন্দ্র রায়ের বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতার কিছু সূত্র যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিক

সেবামূলক মানসিকতার মধ্যে পাওয়া যায় তেমনি তাঁর পরিপার্শ্বিকের প্রভাব ও তাঁর উপর পড়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, তাঁর জীবন"*... largely moulded by three persons- Col. Lukis, the British Principal of the Calcutta Medical College under whom he had his grounding in medical education to rise to dizzy height in the profession, Chittaranjan Das who gave him his early training in politics and parliamentary affairs and finally Mahatma Gandhi for his doctrine of truth and non-violence and their application to the day to day problems of the state and to his own individual self.*"[৬] বিধানচন্দ্র গান্ধীজীর সহকারী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন তাঁর চিকিৎসক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপর গান্ধীজীর মানব সেবার ব্রতর প্রভাব পড়েছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ৪২ বছর বয়সে বিধানচন্দ্র রায়ের প্রথম রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ। ওই বছর তিনি নির্দল হিসাবে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে 'জাতীয়তাবাদের জনক' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং স্বরাজীদের সাহায্যে তিনি জয়ী হন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভাই তিনি স্বরাজ্যদলের সাথে সহযোগিতা করতে থাকেন এবং ক্রমশই তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।[৭] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস এবং ফজলুল হকের কৃষক প্রজা দলের সাথে যৌথ সরকার তৈরির জন্য তিনি প্রচেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন ভারতে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রক্তপাতের মাঝখানে ড. রায়কে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। দেশের প্রয়োজনে ড. রায় আমেরিকা থেকে ফিরে এসে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করতে মনস্থির করেন। সরোজ চক্রবর্তী লিখেছেন- আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি নেহরুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানে লর্ড মাউন্টব্যাটনের সাথে তাঁর আলাপ হয়। সামান্য আলাপ পরিচিতার মধ্যদিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটন বিধানচন্দ্রের দৃঢ় মানসিকতা এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তিনি নেহরুকে অনুরোধ করেন *... 'to send him to the problem-ridden State of Bengal instead of wasting of his talent as Governor of Uttar Pradesh'*[৮]

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলার বিভিন্ন সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের জন্য ঝাঁপিয়ে পরেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষদের সমস্যাকে স্বীকার করেনেন। তাঁর সরকারে প্রাথমিক কর্মসূচীর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন -*'The policy of my Ministry would be generally to satisfy the needs of the people of the province. The Ministry's immediate task was to tackle the food and clothing problem. The second task was to utilize the people who had come from East Bengal (nearly 1 million refugee by then crossed the border) to West Bengal and lastly to remove panic among the border population and, if possible to help in the restoration of confidence among the minorities in East Bengal'*[৯]

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ড. বিধানচন্দ্র রায়- এর অবদানের মূল্যায়ন করতে গেলে আমদের সমকালীন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশকে সামনে রেখে তা করতে হবে। দীর্ঘ ২০০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া ভারতবর্ষ এমনিতেই নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সারা দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়, বিশ্ব বিভক্ত হচ্ছিল দুটি স্বতন্ত্র শিবিরে, বাংলা প্রদেশ যেহেতু সরাসরি বিভক্ত হয়েছিল স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গ হারিয়েছিল তার বিপুল পশ্চাদভূমি এবং

জনসংখ্যা। বাংলা প্রদেশ আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বরাবর একটিই কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। পূর্ববঙ্গের উর্বর ভূমিতে যে শস্য উৎপাদিত হত তা পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি কে পূরণ করত। অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদিত শিল্প পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল পূর্ববঙ্গ। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা প্রদেশের বিভাজন প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করেছিল। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশেক পশ্চিমবঙ্গ তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে পরে। শুধুমাত্র ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের ঘটতি ছিল ৯৫০০০০ টন। পাট শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সঙ্কট, পাট শিল্প কারখানা গুলি বেশিরভাগই অবস্থিত ছিল হুগলী নদীর দুই তীরে। কিন্তু বাংলার প্রায় সমস্ত পাট উৎপাদন ছিল মূলত পূর্ব-বাংলায়। দেশ ভাগ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মিশ্র জনসংখ্যা এবং বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গের থেকে আক্রান্ত হয়ে চলে আসা- পশ্চিমবঙ্গকে আগ্নেয় গিরির প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিল। যেকোনো মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা ছিল। বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আসছিল তার বেশিরভাগই সীমান্তের ওপারে তাদের সবকিছু ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ছিল আক্রান্ত অথবা নির্যাতিত। স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্যাতিত জনতা যেকোনো মুহূর্তে হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কা ছিল। আর তা যদি হত তাহলে তা হত ভয়ঙ্কর।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৭০,০০০। এই ৭০,০০০ এর মধ্যে মোটামুটি ৭৫০০ জনকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এদের বেশীরভাগ ছিল নারী ছিল শিশু। এদের সরকারি ক্যাম্পে স্থায়ী ভাবে আশ্রিত মানুষ হিসেবে গণ্য কর হল। অবশিষ্ট ৬২,৫০০ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। ড. বিধানচন্দ্র রায় যখন ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তখন এই ছিল পরিস্থিতি।[১০] ড. বিধানচন্দ্র রায় প্রথমেই এত কাল ধরে চলে আসা পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ ও ত্রাণ সচিবের পদ স্বতন্ত্র না রেখে তিনি এই দুটি পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এর ফলে ডিপার্টমেন্ট ও ডাইরেক্ট্ররেট এক সাথে কাজ করতে পারবে, ফলে কাজের সুবিধা যেমন হবে তেমনি তা ত্বরান্বিত হবে। তিনি আরও ঠিক করলেন পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলার নির্দেশ দেন। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে বলতে হয় এই সিদ্ধান্ত তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ। কারণ যেখানে নেহরু সহ অনেক বড় নেতৃত্বই মনে করেছিলেন বাঙালি সংখ্যালঘু হিন্দুদের চলে আসা একটি সাময়িক সমস্যা সেখানে বিধানচন্দ্র রায় অনুধাবন করতে পেড়েছিলেন যে এ সমস্যার গভীরতা এবং পঞ্চাশের দশকে পুনর্বাসন সমস্যা যখন সবথেকে ভয়ানক রূপ নিয়েছিল তখন স্বতন্ত্র পুনর্বাসন বিভাগ দারুণ সহায়ক হয়েছিল। এর সাথে সাথে তিনি আরও সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি নিজেই এই বিভাগের দায়িত্ব নেবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে তিনি বাঙ্গালি উদ্বাস্তু সমস্যাকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন। তাঁর আশা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নতুন বিভাগ কাজ করলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত হবে। পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ ও সচিব হিসাবে তিনি নিয়োগ করলেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুনর্বাসনের কাজে সাহায্য এবং পরামর্শ দানের জন্য তিনি একটি পুনর্বাসন বোর্ড স্থাপন করেন। যার সদস্যরা ছিলেন শ্রী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমতি

রেনুকা রায়, শ্রী জীবনান্দ ভট্টাচার্য, ও শ্রী জে. কে. মিশ্র।[১১] পরামর্শ দান এবং সাহায্যের জন্য পুনর্বাসন বোর্ডে একজন মহিলা সদস্য গ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ। বিধানচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এবং পুনর্বাসন দপ্তর, পুনর্বাসন বোর্ড রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে তখনকার মত উদ্বাস্তু সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়ে যায়।

১৯৫০ এর শুরু থেকেই পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করে যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এ সময়ে আসা উদ্বাস্তুরা প্রায় পুরোপুরি সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[১২] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'এখন যারা আসবে, তারা রাজনীতি সম্বন্ধে এত সচেতন নয় যে নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করে রাজনৈতিক অধিকারের অভাবে দেশত্যাগী হবে। তারা প্রধানত কৃষিজীবী শ্রেণির লোক। চাষ করে ফসল উৎপাদন করে অতি সাধারণ মানুষ হিসাবে জীবিকা ধারণের সুযোগ পেলেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু তারাও বোধহয় এবার থাকতে পারবে না। কারণ এবার নিদারুণ অত্যাচার এবং নিপীড়নের ফলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হবে। থেকে গেলে তাদের ঘর পুড়বে, তাদের মেয়েরা ধর্ষিত হবে এবং নিজেরা খুন হবে।'[১৩] ফলে সমস্যা আরও বৃদ্ধিপায়। ড. বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সামগ্রিক উদ্যোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরেন, তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের সীমিত আর্থিক শক্তিতে এই বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিলনা।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারত সরকারের উদ্বাস্তু মন্ত্রকের যুগ্ম-সচিব বি.জি. রাও এর পরামর্শে ড. বিধানচন্দ্র রায়, রেলপথে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য বনগাঁ এবং দর্শনার নিকট দুটি প্রাথমিক আশ্রয় কেন্দ্র খোলার নির্দেশ দেন। এবং এখান থেকে উদ্বাস্তুদের একটি প্রমাণ পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তা পরে বর্ডার-স্লিপ হিসাবে পরিচিত হয়। এই প্রথম পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে এই সব উদ্বাস্তুরা সরকারি আশ্রয় শিবির বা কলোনিগুলিতে আশ্রয় লাভ করত। ড. বিধানচন্দ্র রায় নির্দেশ দেন সরকারের উপর যারা নির্ভর করবে তাদের জন্য বেশি সংখ্যক আশ্রয় শিবির খোলা হোক। এ প্রসঙ্গে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন 'যে বিপুল উদ্বাস্তু আগমনে আশঙ্কিত হয়ে বি.জি. রাও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন-এত যে লোক আসবে তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে উঠতে পারব তো স্যর? এর উত্তরে ড. রায় বলেন, কেন পারব না? নিশ্চয় পারব। এই তো ড. বিধানচন্দ্র রায় যেমন ব্যক্তিত্ব ও ধীশক্তি, তেমন অপরিসীম মানসিক বল। দায়িত্ব যত বড়ই হোক, তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত।'[১৪] তাঁর এই আত্মবিশ্বাস হাজার হাজার নিরুপায় মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং একাত্ম বোধের পরিচায়ক।

উদ্বাস্তু সমস্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল কেন্দ্রীয় সাহায্য সেভাবে পাওয়া যাচ্ছিল না। আসলে নেহরু সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমস্যার গভীরতাকে অনুধাবনের প্রচেষ্টাই করছিলেন না। ড. রায় বারংবার কেন্দ্র সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন চেয়ে ব্যর্থ হন। ড. বিধানচন্দ্র রায়ের পত্রের জবাবে নেহরু লেখা এই পত্র থেকে নেহরুর বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়-*"I realize your difficulties and naturally we should do what we can to help you. But as I told you long ago there is no reasonable solution of the problem if there is large influx from East Bengal. That is why I have been terribly anxious throughout to prevent this, whatever might happen. I still think it was a very wrong thing for some of the Hindu leaders of*

East Bengal to come to West Bengal.....I think that in spite of every difficulty in East Bengal it is far better for our people to face the situation there than to come away." [১৫]

ড. বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় বিমাতৃ সুলভ ব্যবহারের প্রতিবাদ করে এই সব নিঃস্ব দরিদ্র অসহায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন করতে থাকেন। তিনি নেহরু কে লেখেন *'Do you realize that the total grant received for this purpose from your Government in two years – 1948-49 and 1949-50, is a little over three crores and the rest about 5 crores was given in the form of a loan. Do you realize that this sum is 'insignificant' compared to what has been spent for the refugees from West Pakistan? ... For months the Government of India would not recognize the existence of the refugee problems in East Pakistan and therefore, would not accept the liabilities on their account.'*[১৬] ১৯৫০ সালের ২রা মার্চ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রি শ্রী মোহনলাল সাকসেনা ত্রিপুরা, আসাম, বিহার উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের আলোচনায় ঘোষণা করেন- নতুন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবেনা, কেবলমাত্র সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানান হল যে এখন যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আসছে তারা প্রাণভয়ে সাময়িকভাবে এপারে আসছে। শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে তারা তাদের পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা ভিটেমাটির টানে আবার তারা ফিরে যাবে। সুতরাং তাদের স্থায়ী কোন পুনর্বাসনের কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আকস্মিকভাবে এই সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় এবং কি পরিমাণ দায় সরকারকে এব্যাপারে নিতে হবে তা এখনই পরিষ্কার না হওয়ায় এই মুহূর্তে পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত সম্ভব নয়।

ড. বিধানচন্দ্র রায় নেহরুকে আবেদন করেন যে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একা এই বিপুল উদ্বাস্তুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় সেহেতু তিনি যেন অন্যান্য রাজ্য গুলিকে কিছু কিছু দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নেহরু জানান তাঁর অনুরোধ সত্বেও অন্য রাজ্য গুলি এই উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। নেহরু জানান-*'... in spite of our efforts, it is difficult to include most provinces to absorb more refugees. We have been pressing them to do so for a long time'* [১৭]। ড. বিধানচন্দ্র রায় তাঁর নিজ উদ্যোগে উড়িষ্যার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তিনি সফল হন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাতে। তিনি নেহরু কে লেখেন-*'.....In spite of what you have said in your letter that the other provinces will not take our refugees, I am in a position to state that Orissa and the native States which have been absorbed into the province would be glad to have our refugees. I have spoken to the Chief Minister, Sir Mahatab, and he seemed agreeable. I am feeling that a planned arrangement of this type might be made in order to meet the situation'*. [১৮] যাইহোক শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের শত আলাপ- আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যা প্রত্যেকে ২৫০০০ করে উদ্বাস্তুর দায়িত্ব নেবে, আর বিহার ভার নেবে ৫০০০০ বাঙালি উদ্বাস্তুর। ড. বিধানচন্দ্র রায় নিজ উদ্যোগে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন যতদূর সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে পরিত্যক্ত সেনা ছাওনি, খালি জমি, হুকুম দখল করা জমি সব ব্যবহার করতে হবে। নতুন ক্যাম্প, উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপন করে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

এদিকে বন্যার জলের মত লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে পশ্চিমবঙ্গে হাজির হচ্ছিল। নেহরু বাধ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে পুরো ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ, (যেখানে ইতিপূর্বে ত্রাণ এবং সাহায্যের জন্য ড. বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে সদ্য আসা উদ্বস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল)উদ্বাস্তু শিবির পরিভ্রমণ করেন। ড. বিধানচন্দ্র রায় সম্ভবত নেহরুকে সমস্যার গভীরতা খানিকটা বোঝাতে পেরে ছিলেন। নেহরু তাঁর সঙ্গে আসা শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দে-কে (সুরেন্দ্রনাথ দে ইতিপূর্বে নিলেখেরিতে একটি আদর্শ উপনগরী স্থাপন করে ছিলেন) ফুলিয়াতে একটি নিলেখেরির অনুরূপ উপনগরী নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই সময়ে নেহরু দুই দেশের সংখ্যালঘু সমস্যাকে প্রশমিত করার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সাথে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেন। যা 'Liaquat-Nehru Pact' বা 'Delhi Pact' নামে পরিচিত। উভয় দেশ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও এই চুক্তি পুর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘুদের মনে স্থায়ী নিরাপত্তা বোধের সঞ্চারণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৫১ সালের শুরু থেকে আশ্রয় শিবিরে উদ্বাস্তুদের ভর্তির সংখ্যা বেশ কমে এসেছিল। কিন্তু ঐ বছর জুন মাস থেকে আবার উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে ফসল উৎপাদন কমে যায় ফলে দারিদ্র এবং আর্থিক অনটনের থেকে বাঁচতে বেশকিছু মানুষ সীমান্তের এপারে আসতে শুরু করে। সাথে যুক্ত হয় উড়িষ্যা, বিহার থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের সমস্যা। আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজিত প্রসাদ জৈন কলকাতায় আসেন। ড. বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সাথে এইসব সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসেন। ড. বিধানচন্দ্র রায় উদার মনে কুপার্স ক্যাম্পের মানুষদের জন্য জমি সংগ্রহের দায়িত্ব নেন। কুপার্সের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করে। ঠিক হল আর নতুন ক্যাম্প কলোনি প্রতিষ্ঠা না করে সরাসরি জমি নির্ধারণ করে সেখানে উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। ড. রায় বলপ্রয়োগ করে বিহার, উড়িষ্যা থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। এবং তাদের সাহায্য করতে কেন্দ্র সরকারকে বাধ্য করেন।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করলে উদ্বাস্তু আগমন আবার বৃদ্ধি পায়। পরে আর পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া যাবেনা, এই আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গ থেকে আবার বিপুল সংখ্যায় এপারে আসতে থাকেন। যদিও ১৯৫০ এর ঝাপটা সামলানো, ড. বিধানচন্দ্রের রায়ের সরকারের কাছে কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চে দৈনিক ১০০ জন মানুষ আশ্রয় শিবিরে আসছিল।[১৯] ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সংগঠন বিশেষত U.C.R.C র মত কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সরকারের কাছে তারা নানাবিধ দাবি-দাওয়া করতে থকে এবং বেশকিছু দাবি আদায়ে সক্ষমও হয়েছিল।

বাঙালি উদ্বাস্তুদের এই সংগ্রাম আরও কয়েক দশক ধরে চলেছিল। নিজদেশে পর হয়ে পরা এই অসহায় মানুষদের পাশে যেসমস্ত মানুষরা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. বিধানচন্দ্র রায়। তিনি তাঁর প্রচণ্ড দৃঢ়টা, দূরদৃষ্টি, যোগ্য নেতৃত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসের এই অন্যতম বৃহৎ উদ্বাস্তু সমস্যাকে মোকাবিলা করেছিলেন অত্যন্ত দরদের সাথে।

সূত্রনির্দেশ

১. Ian Talbot and Gurharpal Sing. *The Partition of India.* C.U.P, South Asian Edition 2013.

২. Tetsuya Nakatani, "Away from home. The movement and settlement of Refugee from East Pakistan into West Bengal, India." *Journal of the Japanese Association for South Asian Studies*, 12 (2000), p. 89.

৩. Joya Chatterji, *The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-196,* New York: Cambridge University Press, 2007, p. 123.

৪. Prafulla Kumar Chakrobarti, *The Marginal Men: the Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal,* Kalyani, Lumier Books, 1960, p. 12.

৫. অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ : আনুপ্রবেশ,* বর্ণপরিচয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩।

৬. Saroj Chakrabarty, *My Years with Dr. B.C. Roy: A Record Up to 1962, a Documentary In-depth Study of Post-independence Period*. Sree Swaraswaty Press Limited, Calcutta, 1982, pp.1-2.

৭. *Ibid*, p. 2.

৮. *Ibid*, p. 7.

৯. *Ibid*, p. 9.

১০. Prafulla Kumar Chakrobarti, *op.cit*, p. 20.

১১. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৫৫।

১২. Prafulla Kumar Chakrobarti, *op.cit*.

১৩. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৮৪-৮৫।

১৪. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৮৫-৮৬।

১৫. Saroj Chakrabarty, op.cit, pp.30-31.

১৬. *Ibid*, p-20

১৭. *Ibid*, p-30

১৮. *Ibid*, p-31

১৯. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০০।